يُضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَنْ
تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ
حَسَنٰتٍ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٠﴾ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ۙ وَ
إِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ
يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا
مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾
أُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ﴿٧٥﴾
خٰلِدِينَ فِيهَا ۗ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٧٦﴾ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ
رَبِّي لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ۚ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾

سُوْرَةُ الشُّعَرَآءِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مِائَتَانِ وَسَبْعٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً وَّاَحَدَ عَشَرَ رُكُوْعًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

طٰسٓمٓ ﴿١﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ
نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ إِنْ نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ
مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِينَ ﴿٤﴾

(৬৯) কেয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। (৭০) কিন্তু যারা তওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের গোনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৭১) যে তওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে ফিরে আসার স্থান আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে। (৭২) এবং যারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না এবং যখন অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন মান রক্ষার্থে ভদ্রভাবে চলে যায়। (৭৩) এবং যাদেরকে তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ বোঝানো হলে তাতে অন্ধ ও বধির সদৃশ আচরণ করে না। (৭৪) এবং যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে আদর্শস্বরূপ কর। (৭৫) তাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে জান্নাতে কক্ষ দেয়া হবে এবং তাদেরকে তথায় দোয়া ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা করা হবে। (৭৬) তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা কত উত্তম! (৭৭) বলুন, আমার পালনকর্তা পরওয়া করেন না যদি তোমরা তাঁকে না ডাক। তোমরা মিথ্যা বলেছ। অতএব সত্বর নেমে আসবে অনিবার্য শাস্তি।

সূরা আশ-শো'আরা

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ২২৭ আয়াত

আল্লাহ্র নামে শুরু, যিনি পরম মেহেরবান, অপরিসীম দয়ালু।

(১) ত্বা, সীন, মীম। (২) এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। (৩) তারা বিশ্বাস করে না বলে আপনি হয়তো মর্মব্যথায় আত্মঘাতী হবেন। (৪) আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে আকাশ থেকে তাদের কাছে কোন নিদর্শন নাযিল করতে পারি। অতঃপর তারা এর সামনে নত হয়ে যাবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অতঃপর উল্লেখিত অপরাধসমূহ যারা করে, তাদের শাস্তি বর্ণিত হচ্ছে। আয়াতসমূহের পূর্বাপর বর্ণনাধারা থেকে একথা নির্দিষ্ট যে, এই শাস্তি বিশেষভাবে কাফেরদের হবে, যারা শিরক ও কুফরের সাথে সাথে হত্যা এবং ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়। কেননা, প্রথমে তো يُضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ কথাটি মুসলমান গোনাহ্গারদের জন্যে প্রযোজ্য হতে পারে না। কারণ, তাদের এক গোনাহের জন্যে একই শাস্তি কোরআন ও হাদীসে উল্লেখিত আছে। শাস্তির অবস্থাগত অথবা পরিমাণগত বৃদ্ধি মুমিনদের জন্যে হবে না। এটা কাফেরদের বৈশিষ্ট্য কুফরের যে শাস্তি, যদি কাফের ব্যক্তি কুফরের সাথে অন্য পাপও করে, তবে সেই শাস্তি দ্বিগুণ হয়ে যাবে দ্বিতীয়তঃ এই শাস্তি সম্পর্কে আয়াতে وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا কথাটিও বলা হয়েছে ; অর্থাৎ, তারা চিরকাল এই আযাবে লাঞ্ছিত অবস্থায় থাকবে। কোন মুমিন চিরকাল আযাবে থাকবে না। মুমিন যত বড় পাপই করুক, পাপের শাস্তি ভোগ করার পর তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হবে। মোটকথা এই যে, যারা শিরক ও কুফরের সাথে সাথে হত্যা ও ব্যাভিচারেও লিপ্ত হয়, তাদের শাস্তি বর্ধিত হবে, অর্থাৎ, কঠোরও হবে এবং চিরস্থায়ীও হবে। অতঃপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যাদের শাস্তির কথা এখানে বলা হল, এরূপ কঠোর অপরাধী যদি তওবা করে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে সৎকর্ম করতে থাকে, তবে আল্লাহ্ তাআলা তাদের মন্দ কর্মসমূহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। উদ্দেশ্য এই যে, তওবার পর তাদের আমলনামায় পুণ্য থেকে যাবে। কেননা, আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা এই যে, শিরক ও কুফর অবস্থায় যত পাপই করা হোক না কেন, তওবা করতঃ ইসলাম গ্রহণ করার কারণে সেসব বিগত পাপ মাফ হয়ে যাবে। কাজেই অতীতে তাদের আমলনামা যদিও গোনাহ্ ও মন্দ কর্মে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু এখন ঈমান গ্রহণ করার কারণে সেগুলো সব মাফ হয়ে গেছে এবং গোনাহ্ ও মন্দ কর্মের স্থান ঈমান ও সৎকর্ম দখল করে নিয়েছে। মন্দ কর্মসমূহকে পুণ্যে পরিবর্তিত করার এই তফসীর হযরত ইবনে-আব্বাস, হাসান বসরী, সায়ীদ ইবনে জুবায়র, মুজাহিদ প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে।—(মাযহারী)

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا — ব্যবহৃত ঃ এটা পূর্বোক্ত إِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا বাক্যে বিধৃত বিষয়বস্তুর পুনরুক্তি। কুরতুবী কাফফাল থেকে বর্ণনা করেন যে, এই তওবা পূর্বোক্ত তওবা থেকে ভিন্ন ও আলাদা। কারণ, প্রথমটি ছিল কাফের ও মুশরিকদের তওবা, যারা হত্যা ও ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়েছিল, এরপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। ফলে তাদের মন্দ কর্মসমূহ পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেয়া হয়। এখন মুসলমান পাপীদের তওবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই প্রথমোক্ত তওবার সাথে وَاٰمَنَ অর্থাৎ, বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় তওবায় তার উল্লেখ নেই। এতে বোঝা যায় যে, এটা তাদের তওবা, যারা পূর্ব থেকে মুমিনই ছিল ; কিন্তু অনবধানতাবশতঃ হত্যা ও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যে, এরূপ লোক তওবা করার পর যদি মৌখিক তওবা করেই ক্ষান্ত না হয়, বরং ভবিষ্যতের জন্যে তাদের কর্মও সংশোধন করে, তবে তাদের তওবাকে বিশুদ্ধ ও সঠিক মনে করা হবে। এ

কারণেই শর্ত হিসেবে তওবার প্রাথমিক অবস্থা উল্লেখ করার পর তার জওয়াবে শুধু يَتُوبُ উল্লেখ করা শুদ্ধ হয়েছে। কেননা, শর্তে শুধু মৌখিক তওবার উল্লেখ আছে এবং জওয়াবে যে তওবা উল্লেখিত হয়েছে, তা সৎকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট। উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি তওবা করে, অতঃপর সৎকর্ম দ্বারাও তওবার প্রমাণ দেয়, তাকে বিশুদ্ধরূপে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনকারী মনে করা হবে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি অতীত গোনাহ্ থেকে তওবা তো করে ; কিন্তু ভবিষ্যত ক্রিয়াকর্মে এর কোন প্রমাণ দেয় না, তার তওবা যেন তওবাই নয়। আয়াতের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত সার এই যে, যে মুসলমান অনবধানতাবশতঃ পাপে লিপ্ত হয়, অতঃপর তওবা করে এবং তওবার পর কর্মও এমন করে, যদ্দারা তওবার প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে এ তওবাও আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় হবে এবং বাহ্যতঃ এর উপকারিতাও তাই হবে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, তার মন্দ-কাজকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেয়া হবে।

আল্লাহ্‌র বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলীর বর্ণনা চলছিল। মাঝখানে পাপের পর তওবা করার বিধানা-বলী বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর পুনরায় অবশিষ্ট গুণাবলী বর্ণিত হচ্ছে।

দশম গুণ ঃ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ –অর্থাৎ, তারা মিথ্যা ও বাতিল মজলিসে যোগদান করে না। সর্ববৃহৎ মিথ্যা ও বাতিল তো শেরক ও কুফর। এরপর সাধারণ পাপ কর্ম মিথ্যা কাজ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, প্রিয় বান্দাগণ এরূপ মজলিসে যোগদান করা থেকেও বিরত থাকে। হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন, এর অর্থ মুশরিকদের ঈদ, মেলা ইত্যাদি। হযরত মুজাহিদ ও মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া বলেন, এখানে গান –বাজনার মাহফিল বোঝানো হয়েছে। আমর ইবনে-কায়েম বলেন, নির্লজ্জতা ও নৃত্যগীতের মাহফিল বোঝানো হয়েছে। যুহ্‌রী ও ইমাম মালেক বলেন, মদ্যপান করা ও করানোর মজলিস বোঝানো হয়েছে।—(ইবনে-কাসীর) সত্য এই যে, এসব উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এগুলো সবই মিথ্যা ও বাতিল মজলিস। আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের এরূপ মজলিস পরিহার করে থাকা উচিত। কেননা, ইচ্ছা করে বাজে ও বাতিল কর্ম দেখা ও তাতে যোগদান করার সমপর্যায়ভুক্ত।—(মাযহারী) কোন কোন তফসীরবিদ আয়াতের يَشْهَدُونَ শব্দটিকে شهادة অর্থাৎ, সাক্ষ্য দেয়ার অর্থে নিয়েছেন। তাঁদের মতে আয়াতের অর্থ এই যে, তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। মিথ্যা সাক্ষ্য যে মহাবিপদ ও কবীরা গোনাহ্, তা কোরআন ও সুন্নতে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। বোখারী ও মুসলিমে হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মিথ্যা সাক্ষ্যকে সর্ববৃহৎ কবীরা গোনাহ্ আখ্যা দিয়েছেন।

হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায়, তাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা দরকার। এছাড়া তার মুখে চুন-কালি মেখে বাজারে ঘুরিয়ে লাঞ্ছিত করা দরকার। এরপর দীর্ঘদিন কয়েদখানায় আবদ্ধ রাখা প্রয়োজন।—(মাযহারী)

একাদশ গুণ ঃ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا –অর্থাৎ, যদি অনর্থক ও বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে তারা ঘটনাক্রমে কোনদিন গমন করে, তবে গাম্ভীর্য ও ভদ্রতা সহকারে চলে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, এ ধরনের মজলিসে তারা যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে যোগদান করে না, তেমনি যদি ঘটনাচক্রে তারা এমন মজলিসের কাছ দিয়েও গমন করে, তবে পাপাচারের এসব মজলিসের কাছ দিয়ে ভদ্রতা বজায় রেখে চলে যায়। অর্থাৎ, মজলিসের কাজকে মন্দ ও ঘৃণার্হ জানা সত্ত্বেও পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে না এবং নিজেদেরকে তাদের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে অহংকারে লিপ্ত হয় না। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) একদিন ঘটনাক্রমে বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে গমন করেন। তিনি সেখানে না দাঁড়িয়ে সোজা চলে যান। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একথা জানতে পেরে বললেন, ইবনে মাসউদ করীম অর্থাৎ, ভদ্র হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন, যাতে অনর্থক মজলিসের কাছ দিয়ে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোকদের ন্যায় চলে যাওয়ার নির্দেশ আছে।— (ইবনে-কাসীর)

দ্বাদশ গুণ ঃ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا — অর্থাৎ, এই প্রিয় বান্দাগণকে যখন আল্লাহ্ আয়াত ও আখেরাতের কথা স্মরণ করানো হয়, তখন তারা এসব আয়াতের প্রতি অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় মনোযোগ দেয় না ; বরং শ্রবণশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের ন্যায় এগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে ও তদনুযায়ী আমল করে। অনবধান ও বোকা লোকদের ন্যায় এরূপ আচরণ করে না যে, তারা যেন শোনেইনি কিংবা দেখেইনি। এই আয়াতে দু'টি বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। (এক) আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের উপর পতিত হওয়া অর্থাৎ, গুরুত্ব সহকারে মনোনিবেশ করা। এটা প্রশংসনীয়, কাম্য ও বিরাট পুণ্য কাজ। (দুই) অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় পতিত হওয়া ; অর্থাৎ, কোরআনের আয়াতসমূহের প্রতি মনোনিবেশ করা হয় বটে, কিন্তু আমলের ব্যাপারে এমন করা যেন শোনেইনি ও দেখেইনি অথবা আমলও করা হয়, কিন্তু বিশুদ্ধ মূলনীতি এবং সাহাবা তাবেয়িগণের মতামতের খেলাফ নিজের মতে কিংবা জনশ্রুতির অনুসরণে ভ্রান্ত আমল করা। এটাও এক রকম অন্ধ-বধির হয়েই পতিত হওয়ার পর্যায়ভুক্ত।

শরীয়তের বিধানাবলী পাঠ করাই যথেষ্ট নয় ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌র আয়াতের প্রতি মনোনিবেশই না করা এবং অন্ধ ও বধিরের ন্যায় আচরণ করার যেমন নিন্দা করা হয়েছে ; তেমনি না বুঝে, না শুনে নিজের মতামতের উপর ভিত্তি করে যেভাবে ইচ্ছা, সেভাবে মনোনিবেশ করা এবং আমল করারও নিন্দা করা হয়েছে। ইবনে কাসীর ইবনে-আওন থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত শা'বীকে জিজ্ঞেস করেন, যদি আমি এমন কোন মজলিসে উপস্থিত হই, যেখানে সবাই সেজদারত আছে এবং আমি জানি না, এটা কোন্ প্রকার সেজদা, তবে আমিও কি তাদের সাথে সেজদায় শরীক হয়ে যাব? হযরত শা'বী বললেন, না। না বুঝে না শুনে কোন কাজে লেগে যাওয়া মুমিনের জন্যে বৈধ নয় ; বরং বুঝে-শুনে আমল করা তার জন্যে জরুরী। তুমি যখন সেজদার সেই আয়াতটি শোননি, যার ভিত্তিতে তারা সেজদা করছে এবং তুমি তাদের সেজদার স্বরূপও জান না, তখন এভাবে তাদের সাথে সেজদায় শরীক হয়ে যাওয়া জায়েয নয়।

ত্রয়োদশ গুণ ঃ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا — এতে নিজ সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের জন্যে আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করা হয়েছে যে, তাদেরকে আমার জন্যে চোখের শীতলতা স্বরূপ করে দিন। চোখের শীতলতা করার উদ্দেশ্য হযরত হাসান বসরীর তফসীর অনুযায়ী তাদেরকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে মশগুল দেখা। একজন মানুষের জন্য এটাই চোখের শীতলতা। যদি সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের বাহ্যিক স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকেও এর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়, তবে তাও দুরস্ত।

এখানে এই দোয়া দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণ কেবল নিজেদের সংশোধন ও সৎকর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন না ; বরং তাদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদেরও আমল সংশোধন এবং চরিত্র উন্নয়নের চেষ্টা করেন। এই চেষ্টারই অংশ হিসেবে তাদের সৎকর্ম পরায়ণতার জন্যে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেন। আয়াতের পরবর্তী বাক্যে দোয়ার এই অংশটিও প্রনিধানযোগ্য وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا আমাদেরকে মুত্তাকীগণের নেতা ও ইমাম করে দিন। এতে বাহ্যতঃ নিজের জন্যে জাঁকজমক, পদমর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের দোয়া আছে, যা কোরআনের অন্যান্য আয়াতদৃষ্টে নিষিদ্ধ, যেমন এক আয়াতে আছে ঃ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا –অর্থাৎ আমি পরকালের গৃহ তাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছি, যারা ভূপৃষ্ঠে শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করে না এবং অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। তাই কোন কোন আলেম এই আয়াতের তফসীরে বলেন ঃ প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিবার-পরিজনের ইমাম ও নেতা স্বাভাবিকভাবে হয়েই থাকে। কাজেই এই দোয়ার সারমর্ম এই যে, আমাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে মুত্তাকী করে দিন। তারা মুত্তাকী হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যক্তি মুত্তাকীগণের ইমাম ও নেতা কথিত হবেন। সুতরাং এখানে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দোয়া করা হয়নি ; বরং সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদেরকে মুত্তাকী করার দোয়া করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম নাখয়ী বলেন, এই দোয়ায় নিজের জন্যে কোন সরদারী ও নেতৃত্ব প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য নয় ; বরং উদ্দেশ্য এই যে, আমাদেরকে এরূপ যোগ্য করে দিন, যাতে মানুষ ধর্ম ও আমলে আমাদের অনুসরণ করে এবং আমাদের জ্ঞান ও আমল দ্বারা তারা উপকৃত হয়। ফলে আমরা এর সওয়াব পাব। হযরত মকহুল শামী বলেন, দোয়ার উদ্দেশ্য নিজের জন্য তাকওয়া ও আল্লাহ্ভীতির এমন উচ্চস্তর অর্জন করা, যদ্দারা মুত্তাকীগণ লাভবান হয়। কুরতুবী উভয় উক্তি বর্ণনা করার পর বলেন, উভয় উক্তির সারকথা একই ; অর্থাৎ, যে সরদারী ও নেতৃত্ব ধর্ম ও পরকালের উপকারার্থে তলব করা হয়, তা নিন্দনীয় নয়—জায়েয। পক্ষান্তরে। لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا আয়াতে সেই সরদারী ও নেতৃত্বেই নিন্দা করা হয়েছে, যা পার্থিব সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জনের নিমিত্ত হয়। والله اعلم এ পর্যন্ত 'ইবাদুর রহমান' অর্থাৎ, কামেল মুমিনদের প্রধান গুণাবলীর বর্ণনা সমাপ্ত হল। অতঃপর তাদের প্রতিদান ও পরকালীন মর্তবার বিষয় বর্ণিত হচ্ছে।

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ – غرفة –শব্দের আভিধানিক অর্থ বালাখানা তথা উপরতলার কক্ষ। বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্তগণ এমন বালাখানা পাবে, যা সাধারণ জান্নাতীগণের কাছে তেমনি দৃষ্টিগোচর হবে, যেমন পৃথিবীর লোকদের কাছে তারকা-নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়।—(বোখারী, মুসলিম, মাযহারী) মুসনাদ আহমদ, বায়হাকী, তিরমিযী ও হাকিমে হযরত আবু মালেক আশআরী থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, জান্নাতে এমন কক্ষ থাকবে, যার ভেতরের অংশ বাইরে থেকে এবং বাইরের অংশ ভেতর থেকে দৃষ্টিগোচর হবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) এসব কক্ষ কাদের জন্যে ? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নম্র ও পবিত্র কথাবার্তা বলে, প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম করে, ক্ষুধার্তকে আহার করায় এবং রাত্রে যখন সবাই নিদ্রিত থাকে, তখন সে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে।—(মাযহারী)

وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا –অর্থাৎ, জান্নাতের অন্যান্য নেয়ামতের সাথে তারা এই সম্মানও লাভ করবে যে, ফেরেশতাগণ তাদেরকে মোবারকবাদ জানাবে এবং সালাম করবে। এ পর্যন্ত খাঁটি মুমিনদের বিশেষ অভ্যাস, কর্ম ও এ সবের প্রতিদান ও সওয়াবের আলোচনা ছিল। শেষ আয়াতে পুনর্বার কাফের ও মুশরিকদেরকে আযাবের ভয় প্রদর্শন করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ — এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে অনেক উক্তি আছে। উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপে যা লিখিত হয়েছে, তাই অধিক স্পষ্ট ও সহজ। তা এই যে, আল্লাহ্র কাছে তোমাদের কোন গুরুত্ব থাকত না যদি তোমাদের পক্ষ থেকে তাকে ডাকা ও তাঁর এবাদত করা না হত। কেননা, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই আল্লাহ্র এবাদত করা। যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ — অর্থাৎ, আমি মানব ও জিনকে আমার এবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজের জন্যে সৃষ্টি করিনি। এ হচ্ছে একটি সাধারণ বিধির বর্ণনা যে, এবাদত ব্যতীত মানুষের কোন মূল্য, গুরুত্ব ও সম্মান নেই। এরপর রেসালত এবং এবাদতে অবিশ্বাসী কাফের ও মুশরিকদেরকে বলা হয়েছে ঃ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ — অর্থাৎ, তোমরা সবকিছুকে মিথ্যাই বলে দিয়েছ। এখন আল্লাহ্র কাছে তোমাদের কোন গুরুত্ব নেই।

فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا –অর্থাৎ, এখন এই মিত্যারোপ ও কুফর তোমাদের কণ্ঠহার হয়ে গেছে। তোমাদেরকে জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাবে লিপ্ত না করা পর্যন্ত এটা তোমাদের সাথে থাকবে।

সূরা আশ্-শোআরা

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ – بَاخِعٌ শব্দটি بخع থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ যবেহ্ করতে করতে বিখা' (গর্দানের একটি শিরা) পর্যন্ত পৌঁছা। এখানে অর্থ হলো নিজেকে কষ্ট ও ক্লেশে পতিত করা। আল্লামা আসকারী বলেন, এ ধরনের স্থানে বাক্যের আকার খবরবোধক হলেও প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য, নিষেধ করা। অর্থাৎ, হে পয়গম্বর, স্বজাতির কুফর ও ইসলামের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন দেখে দুঃখ ও বেদনায় আত্মঘাতী হবেন না। এই আয়াত থেকে প্রথমতঃ জানা গেল যে, ভাগ্যে ঈমান নেই—কোন কাফের সম্পর্কে এরূপ জানা গেলেও তার কাছে ধর্ম প্রচারে বিরত হওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ জানা গেল যে, ক্লেশ স্বীকারে সমতা দরকার। যে ব্যক্তি হেদায়েত থেকে বঞ্চিত থাকে তার জন্যে অধিক দুঃখ না করা উচিত।

إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ

আল্লামা যমখশরী বলেন, আসল বাক্য হচ্ছে فظلوا لها خاضعين অর্থাৎ, কাফেররা এই বড় নিদর্শন দেখে অনুগত ও নত হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে বিনয়ের স্থান প্রকাশ করার উদ্দেশে اعناق (গর্দান) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, নত হওয়া ও বিনয়ী হওয়ার ভাব সর্বপ্রথম গর্দানে প্রকাশ পায়। আয়াতের বিষয়বস্তু এই যে, আমি নিজ তওহীদ ও কুদরতের এমন

وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ
مُعْرِضِينَ ﴿٥﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ
زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨﴾
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ
ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَتَّقُونَ ﴿١١﴾ قَالَ رَبِّ
إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿١٢﴾ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي
فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ﴿١٣﴾ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾
قَالَ كَلَّا ۖ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا ۖ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ
فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٧﴾
قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾
وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ قَالَ فَعَلْتُهَا
إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٢٠﴾ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي
رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ
أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾

(৫) যখনই তাদের কাছে রহমান-এর কোন নতুন উপদেশ আসে, তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৬) অতএব তারা তো মিথ্যারোপ করেছেই; সুতরাং যে বিষয় নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তার যথার্থ স্বরূপ শীঘ্রই তাদের কাছে পৌঁছবে। (৭) তারা কি ভূপৃষ্ঠের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না? আমি তাতে সর্বপ্রকার বিশেষ-বস্তু কত উদ্গত করেছি! (৮) নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (৯) আপনার পালনকর্তা তো পরাক্রমশালী পরম দয়ালু। (১০) যখন আপনার পালনকর্তা মূসাকে ডেকে বললেন ঃ তুমি পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নিকট যাও; (১১) ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট; তারা কি ভয় করে না? (১২) সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমার আশংকা হচ্ছে যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে দেবে। (১৩) এবং আমার মন হতবল হয়ে পড়ে এবং আমার জিহবা অচল হয়ে যায়। সুতরাং হারূনের কাছে বার্তা প্রেরণ করুন! (১৪) আমার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ আছে। অতএব আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। (১৫) আল্লাহ্ বলেন, কখনই নয়, তোমরা উভয়ে যাও আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে। আমি তোমাদের সাথে থেকে শোনব। (১৬) অতএব তোমরা ফেরআউনের কাছে যাও এবং বল, আমরা বিশ্বজগতের পালনকর্তার রসূল। (১৭) যাতে তুমি বনী-ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যেতে দাও। (১৮) ফেরআউন বলল, আমরা কি তোমাকে শিশু অবস্থায় আমাদের মধ্যে লালন-পালন করিনি? এবং তুমি আমাদের মধ্যে জীবনের বহু বছর কাটিয়েছ। (১৯) তুমি সেই—তোমরা অপরাধ যা করবার করেছ। তুমি হলে কৃতঘ্ন। (২০) মূসা বলল, আমি সে অপরাধ তখন করেছি, যখন আমি ভ্রান্ত ছিলাম। (২১) অতঃপর আমি ভীত হয়ে তোমাদের কাছ থেকে পলায়ন করলাম। এরপর আমার পালনকর্তা আমাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং আমাকে পয়গম্বর করেছেন। (২২) আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা বলছ, তা এই যে, তুমি বনী-ইসরাঈলকে গোলাম বানিয়ে রেখেছ। (২৩) ফেরাউন বলল, বিশ্বজগতের পালনকর্তা আবার কি?

কোন নিদর্শন প্রকাশ করতেও সক্ষম, যাতে শরীয়তের নির্দেশাবলী ও খোদায়ী স্বরূপ জাজ্জ্বল্যমান হয়ে সামনে এসে যায় এবং কারো পক্ষে অস্বীকার করার যো না থাকে। কিন্তু এসব নির্দেশ ও তত্ত্ব জাজ্জ্বল্যমান না হওয়া বরং চিন্তা-ভাবনার উপর নির্ভরশীল থাকাই রহস্যের দাবী। চিন্তা-ভাবনাই মানুষের পরীক্ষা এবং এর ভিত্তিতেই সওয়াব ও আযাব বর্তিত। জাজ্জ্বল্যমান বিষয়সমূহকে স্বীকার করা তো একটি স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার। এতে এবাদত ও আনুগত্যের শান নেই।— (কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

زَوْجٍ كَرِيمٍ - زَوْجٍ এর শাব্দিক অর্থ যুগল। এ কারণেই পুরুষ ও স্ত্রী, নর ও নারীকে زَوْجٍ বলা হয়। অনেক বৃক্ষের মধ্যেও নর ও নারী থাকে; সেগুলোকে এদিক দিয়ে زَوْجٍ বলা যায়। কোন সময় এ শব্দটি বিশেষ প্রকার ও শ্রেণীর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ হিসেবে বৃক্ষের প্রত্যেক প্রকারকে زَوْجٍ বলা যায়। كَرِيمٍ শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট ও পছন্দনীয় বস্তু।

আনুগত্যের জন্যে সহায়ক উপকরণ প্রার্থনা করা বাহানা অন্বেষণ নয় ঃ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ - وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ

এসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন আদেশ পালনের ব্যাপারে কোন সহায়ক বস্তু প্রার্থনা করা বাহানা অন্বেষণ নয়; বরং বৈধ। যেমন মূসা (আঃ) আল্লাহ্র আদেশ পেয়ে তার বাস্তবায়ন সহজ ও ফলপ্রসূ করার জন্যে আল্লাহ্ তাআলার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। কাজেই এখানে একথা বলা ভুল হবে যে, হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্র আদেশকে নির্দিধায় শিরোধার্য করে নিলেন না কেন এবং দেরী করলেন কেন? কারণ, মূসা (আঃ) যা করেছেন, তা আদেশ পালনেরই পর্যায়ে করেছেন।

হযরত মূসা (আঃ) এর জন্যে ضلال শব্দের অর্থ ঃ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ তুমি এক কিবতীকে হত্যা করেছিলে ফেরআউনের এই অভিযোগের জওয়াবে মূসা (আঃ) বললেন, ঃ হাঁ, আমি হত্যা অবশ্যই করেছিলাম; কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড ইচ্ছাকৃত ছিল না; বরং কিবতীকে তার ভুল বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে ঘুষি মেরেছিলাম যার ফলে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। সারকথা এই যে, ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড নবুওয়তের পরিপন্থী। আর এ হত্যাকাণ্ড অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছিল। কাজেই এখানে ضلال শব্দের অর্থ অজ্ঞাত তথা অনিচ্ছাকৃতভাবে কিবতীর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়া। হযরত কাতাদাহ্ ও ইবনে যায়দের রেওয়ায়েত থেকে এই অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। আরবী ভাষায় ضلال শব্দের অর্থ একাধিক এবং সর্বত্রই এর অর্থ পথভ্রষ্টতা হয় না। এখানেও এর অনুবাদ 'পথভ্রষ্ট' করা ঠিক নয়।

মহিমান্বিত আল্লাহ্র সত্তা ও স্বরূপের জ্ঞান লাভ করা মানুষের জন্যে সম্ভবপর নয় ঃ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহিমান্বিত আল্লাহ্র স্বরূপ জানা সম্ভবপর নয়। কারণ, ফেরআউনের প্রশ্ন ছিল আল্লাহ্র স্বরূপ সম্পর্কে। মূসা (আঃ) স্বরূপ বর্ণনা করার পরিবর্তে আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলার স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভবপর নয় এবং

قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٢٤﴾
قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗۤ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ
الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٦﴾ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْۤ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ﴿٢٧﴾
قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾
قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ﴿٢٩﴾
قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٠﴾ قَالَ فَاْتِ بِهٖۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ
الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾ فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿٣٢﴾ وَّنَزَعَ يَدَهٗ
فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿٣٣﴾ قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗۤ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ
عَلِيْمٌ ﴿٣٤﴾ يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ۖ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ﴿٣٥﴾
قَالُوْۤا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿٣٦﴾ يَاْتُوْكَ بِكُلِّ
سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ﴿٣٧﴾ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٣٨﴾ وَّقِيْلَ
لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ ﴿٣٩﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ
كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿٤٠﴾ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ
لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿٤١﴾ قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ
الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٤٢﴾ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰۤى اَلْقُوْا مَاۤ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿٤٣﴾

(২৪) মূসা বলল, তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (২৫) ফেরাউন তার পারিষদবর্গকে বলল, তোমরা কি শুনছ না? (২৬) মূসা বলল, তিনি তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও পালনকর্তা। (২৭) ফেরাউন বলল, তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রসূলটি নিশ্চয়ই বদ্ধ পাগল। (২৮) মূসা বলল, তিনি পূর্ব, পশ্চিম ও এতদুভয়ের মধ্যব্যর্তী সব কিছুর পালনকর্তা, যদি তোমরা বোঝ। (২৯) ফেরাউন বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব। (৩০) মূসা বলল, আমি তোমার কাছে কোন স্পষ্ট বিষয় নিয়ে আগমন করলেও কি? (৩১) ফেরাউন বলল, তুমি সত্যবাদী হলে তা উপস্থিত কর। (৩২) অতঃপর তিনি লাঠি নিক্ষেপ করলে মুহূর্তের মধ্যে তা সুস্পষ্ট অজগর হয়ে গেল। (৩৩) আর তিনি তার হাত বের করলেন, তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের কাছে সুশুভ্র প্রতিভাত হলো। (৩৪) ফেরাউন তার পারিষদবর্গকে বলল, নিশ্চয় এ একজন সুদক্ষ জাদুকর। (৩৫) সে তার জাদু বলে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করতে চায়। অতএব তোমাদের মত কি? (৩৬) তারা বলল, তাকে ও তার ভাইকে কিছু অবকাশ দিন এবং শহরে শহরে ঘোষক প্রেরণ করুন। (৩৭) তারা যেন আপনার কাছে প্রত্যেকটি দক্ষ জাদুকরকে উপস্থিত করে। (৩৮) অতঃপর এক নির্দিষ্ট দিনে জাদুকরদেরকে একত্রিত করা হল। (৩৯) এবং জনগণের মধ্যে ঘোষণা করা হল, তোমরাও সমবেত হও, (৪০) যাতে আমরা জাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি—যদি তারাই বিজয়ী হয়। (৪১) যখন জাদুকররা আগমণ করল, তখন ফেরআউনকে বলল, যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে আমরা পুরস্কার পাব তো? (৪২) ফেরাউন বলল, হাঁ এবং তখন তোমরা আমার নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (৪৩) মূসা (আঃ) তাদেরকে বললেন, নিক্ষেপ কর তোমরা যা নিক্ষেপ করবে।

এরূপ প্রশ্ন করাই অযথা।—(রূহুল মা'আনী)

اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ বনী ইসরাঈল ছিল শাম দেশের বাসিন্দা। তাদেরকে স্বদেশে যেতে ফেরাউন বাধা দিত। এভাবে চার শত বছর ধরে তারা ফেরআউনের বন্দীশালায় গোলামীর জীবন যাপন করছিল। তখন তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ছয় লাখ ত্রিশ হাজার। মূসা (আঃ) ফেরআউনকে সত্যের পয়গাম পৌছানোর সাথে সাথে বনী ইসরাঈলের প্রতি নির্যাতন থেকে বিরত হওয়ার এবং তাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।—(কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পয়গম্বরসূলভ বিতর্কের একটি নমুনা ও তার কার্যকরী রীতিনীতি ঃ দুই ভিন্নমুখী চিন্তাধারার বাহক ব্যক্তি ও দলের মধ্যে আদর্শগত বাকবিতণ্ডা যাকে পরিভাষায় মুনাযারা বা বিতর্ক বলা হয়, প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত আছে। কিন্তু সাধারণভাবে এই বিতর্ক একটি হারজিতের খেলায় পর্যবসিত হয়ে গেছে। মানুষের দৃষ্টিতে বিতর্কের সারমর্ম এতটুকুই যে, নিজের দাবী সর্বাবস্থায় উচ্চে থাকতে হবে যদিও এর ভ্রান্তি নিজেরও জানা হয়ে যায়। এই দাবীকে নির্ভুল ও জোরদার প্রমাণ করার জন্যে সাক্ষ্য-প্রমাণ ও মেধাশক্তি নিঃশেষে ব্যয় করতে হবে। এমনিভাবে প্রতিপক্ষের কোন দাবী সত্য ও নির্ভুল হলেও তা খন্ডন করতে হবে এবং খণ্ডনে পূর্ণশক্তি নিয়োজিত করতে হবে। ইসলামই এই বিতর্কে বিশেষ সমতা আনয়ন করেছে। এর মূলনীতি, ধারা, পদ্ধতি ও সীমা নির্ধারণ করে একে প্রচার ও সংশোধনকার্যের একটি উপকারী ও কার্যকরী হাতিয়ারে পরিণত করেছে।

আলোচ্য আয়াতে এর একটি সংক্ষিপ্ত নমুনা লক্ষ্য করা যায়। হযরত মূসা ও হারূন (আঃ) যখন ফেরআউনের মত স্বৈরাচারী ও খোদায়ীর দাবীদারকে তার দরবারের সত্যের পয়গাম পৌছালেন, তখন সে মূসা (আঃ)-এর ব্যক্তিগত দু'টি বিষয় দ্বারা বিরোধী আলোচনা ও তর্কবিতর্কের সূত্রপাত করল, যেমন সুচতুর প্রতিপক্ষ সাধারণতঃ যখন আসল বিষয়ের জওয়াব দিতে সক্ষম হয় না; তখন অপর পক্ষের ব্যক্তিগত দুর্বলতা খোঁজ করে এবং বর্ণনা করে, যাতে সে লজ্জিত হয়ে যায় এবং জনমনে তার ভাবমূর্তী ক্ষুন্ন হয়। এখানেও ফেরআউন দু'টি বিষয় বর্ণনা করল। (এক) তুমি আমাদের লালিত-পালিত এবং আমাদের গৃহে থেকে যৌবনে পদার্পন করেছ। তোমার প্রতি আমাদের অনেক অনুগ্রহ আছে। কাজেই তোমার সাধ্য কি যে, আমাদের সামনে কথা বল! (দুই) তুমি একজন কিবতীকে অহেতুক হত্যা করেছ। এটা যেমন জুলুম, তেমনি নিমকহারামী ও কৃতঘ্নতা। যে সম্প্রদায়ের স্নেহে লালিত-পালিত হয়েছ এবং যৌবনে পদার্পন করেছ, তাদেরই একজনকে তুমি হত্যা করেছ। এর বিপরীতে হযরত মূসা (আঃ)-এর পয়গম্বরসুলভ জওয়াব দেখুন। প্রথমতঃ তিনি জওয়াবে প্রশ্নের ক্রম পরিবর্তন করে কিবতীর হত্যাকাণ্ডের জওয়াব প্রথমে দিলেন ; যা ফেরআউন পরে উল্লেখ করেছিল এবং গৃহে লালিত-পালিত হওয়ার অনুগ্রহ, যা ফেরআউন প্রথমে উল্লেখ করেছিল, তার জওয়াব পরে দিলেন। এই ক্রমপরিবর্তনের রহস্য এরূপ মনে হয় যে, তাঁর দুর্বলতার কারণে হত্যার বিষয়কে পাশ কাটিয়েই যাওয়া হয় এবং অন্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্র রসূল এর জওয়াবকেই অগ্রাধিকার দিলেন এবং জওয়াবও মোটামুটি দোষ স্বীকারের মাধ্যমেই দিলেন। প্রতিপক্ষ বলবে যে, তিনি দোষ স্বীকার করে

فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ
الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٤٥﴾
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ رَبِّ مُوسَىٰ
وَهَارُونَ ﴿٤٨﴾ قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي
عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم
مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ
رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿٥٢﴾
فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ
قَلِيلُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴿٥٥﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴿٥٦﴾
فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٧﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾ كَذَٰلِكَ
وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾ فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا تَرَاءَى
الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ
رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ
فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ ﴿٦٤﴾

(৪৪) অতঃপর তারা তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং বলল, ফেরাউনের ইযযতের কসম, আমরাই বিজয়ী হব। (৪৫) অতঃপর মূসা তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করল, হঠাৎ তা তাদের অলীক কীর্তিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল। (৪৬) তখন জাদুকররা সেজদায় নত হয়ে গেল। (৪৭) তারা বলল, আমরা রাব্বুল আলামীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম, (৪৮) যিনি মূসা ও হারূনের রব। (৪৯) ফেরাউন বলল, আমার অনুমতি দানের পূর্বেই তোমরা কি তাকে মেনে নিলে? নিশ্চয় সে তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। শীঘ্রই তোমরা পরিণাম জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করব এবং তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব। (৫০) তারা বলল, কোন ক্ষতি নেই। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করব। (৫১) আমরা আশা করি, আমাদের পালনকর্তা আমাদের ক্রটি-বিচ্যুতি মার্জনা করবেন। কারণ, আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারীদের মধ্যে অগ্রণী। (৫২) আমি মূসাকে আদেশ করলাম যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিযোগে বের হয়ে যাও; নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। (৫৩) অতঃপর ফেরাউন শহরে শহরে সংগ্রাহকদেরকে প্রেরণ করল, (৫৪) নিশ্চয় এরা (বনী-ইসরাঈলরা) ক্ষুদ্র একটি দল। (৫৫) এবং তারা আমাদের ক্রোধের উদ্রেক করেছে। (৫৬) এবং আমরা সবাই সদা শংকিত। (৫৭) অতঃপর আমি ফেরআউনের দলকে তাদের বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাসমূহ থেকে বহিষ্কার করলাম (৫৮) এবং ধন-ভাণ্ডার ও মনোরম স্থানসমূহ থেকে। (৫৯) এরূপই হয়েছিল এবং বনী-ইসরাঈলকে করে দিলাম এসবের মালিক। (৬০) অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। (৬১) যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীরা বলল, আমরা যে ধরা পড়ে গেলাম! (৬২) মূসা বলল, কখনই নয়, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে পথ বলে দেবেন। (৬৩) অতঃপর আমি মূসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত কর। ফলে, তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল। (৬৪) আমি সেথায় অপর দলকে পৌঁছিয়ে দিলাম।

পরাজয় মেনে নিয়েছেন, তিনি মোটেই এদিকে ভ্রূক্ষেপ করেননি।

হযরত মূসা (আঃ) জওয়াবেই কথা স্বীকার করে নিলেন যে, এ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকে ভুল ও বিচ্যুতি হয়ে গেছে; কিন্তু সাথে সাথে এ সত্যও ফুটিয়ে তুললেন যে, এটা একটা সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত পদক্ষেপ ছিল, যা ঘটনাক্রমে অবাঞ্ছিত পরিণতি লাভ করে ফেলে। লক্ষ্য ছিল, কিবতীকে ইসরাঈলীর প্রতি জুলুম থেকে বিরত করা। এই লক্ষ্যেই তাকে একটি ঘুষি মারা হয়েছিল। ঘটনাক্রমে সে এতে মারা গেল। তাই এ হত্যাকাণ্ড ছিল ভ্রান্তিপ্রসূত। কাজেই আমার নবুওয়ত দাবীর সত্যতায় এটা কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। আমি এই ভুল জানতে পেরে আইনগত ধর-পাকড়ের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেলাম। আল্লাহ্ তাআলা অতঃপর আমার প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং আমাকে নবুওয়ত ও রেসালত দ্বারা ভূষিত করেন।

أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ অর্থাৎ, হযরত মূসা (আঃ) জাদুকরদেরকে বললেন, তোমাদের যা জাদু প্রদর্শন করবার, প্রদর্শন কর। এতে ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে দেখলে সন্দেহ হয় যে, মূসা (আঃ) তাদেরকে জাদু প্রদর্শনের নির্দেশ দিচ্ছেন কেমন করে? কিন্তু সামান্য চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এটা মূসা (আঃ)-এর পক্ষ থেকে জাদু প্রদর্শনের নির্দেশ ছিল না, বরং তাদের যা কিছু করবার ছিল, তা বাতিল করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তবে যেহেতু প্রকাশ করা ব্যতীত বাতিল করা অসম্ভব ছিল, তাই তিনি জাদুকরদেরকে জাদু প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন; যেমন, কোন আল্লাহ্দ্রোহীকে বলা হয় যে, তুমি তোমার আল্লাহ্দ্রোহীতার প্রমাণাদি পেশ কর, যাতে আমি সেগুলোকে বাতিল প্রমাণ করতে পারি। বলাবাহুল্য, একে আল্লাহ্দ্রোহিতায় সম্মতি বলা যায় না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ এ বাক্যটি জাদুকরদের জন্যে কসম পর্যায়ের। মূর্খতাযুগে এর প্রচলন ছিল। পরিতাপের বিষয়! আজকাল মুসলমানদের মধ্যেও এরূপ কসম প্রচলিত হয়ে গেছে, যা এর চাইতেও মন্দ। উদাহরণতঃ বাদশাহ্র কসম, তোমার বাপের কবরের কসম ইত্যাদি। এ ধরনের কসম শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয; বরং এগুলো সম্পর্কে একথা বলা ভুল হবে না যে, আল্লাহ্র নামে মিথ্যা কসম খাওয়া যেমন বিরাট পাপ, এসব নামের সত্য কসম খাওয়াও তার চাইতে কম পাপ নয়।—(রূহুল-মা'আনী)

قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ অর্থাৎ, যখন ফেরআউন জাদুকরদেরকে বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে হত্যা, হস্তপদ কর্তন ও শূলে চড়ানোর হুমকি দিল, তখন জাদুকররা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে জওয়াব দিল, তুমি যা করতে পার, করো আমাদের কোন ক্ষতি নেই। আমরা নিহত হলেও পালনকর্তার কাছে পৌঁছে যাব। সেখানে আরামই আরাম।

এখানে চিন্তা করার বিষয় এই যে, আজীবন জাদুর কুফরে লিপ্ত, ফেরআউনের উপাস্যতা স্বীকারকারী এবং ফেরআউনের পূজা-অর্চনাকারী এই জাদুকররা মূসা (আঃ)-এর মু'জেযা দেখে স্বজাতির বিপক্ষে, ফেরআউনের মত স্বৈরাচারী সম্রাটের বিরুদ্ধে ঈমানের কথা ঘোষণা করল কিরূপে? এটা নিতান্তই বিস্ময়কর ব্যাপার। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এখানে শুধু ঈমানের ঘোষণাই নয়; বরং ঈমানের এমন গভীর রঙও প্রকাশ পেয়েছে যে, কেয়ামত ও পরকাল যেন তাদের চোখের সামনে

উদ্ভাসিত হয়ে গেছে, তারা পরকালের নেয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করতে শুরু করেছে। ফলে দুনিয়ার যে কোন শাস্তি ও বিপদকে উপেক্ষা করে তারা فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ (তোমরা যা করবার, করে ফেল) বলে দিয়েছে। এটাও প্রকৃতপক্ষে মূসা (আঃ)-এরই মু'জেযা, যা লাঠি ও সুশুভ্র হাতের মু'জেযার চাইতে কোন অংশে কম নয়। এ ধরনের অনেক ঘটনা আমাদের প্রিয় রসূল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাতে প্রকাশ পেয়েছে। এক মিনিটের মধ্যে সত্তর বছরের কাফেরের মধ্যে এমন অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে যে, সে শুধু মুমিনই নয়; বরং যোদ্ধা সেজে শহীদ হওয়ার বাসনা প্রকাশ করতে শুরু করেছে।

وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ —এ আয়াতে বাহ্যতঃ বলা হয়েছে যে, ফেরআউন সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত বিষয় সম্পত্তি, বাগ-বাগিচা ও ধন-ভাণ্ডারের মালিক তাদের নিমজ্জিত হওয়ার পর বনী-ইসরাঈলকে করে দেয়া হয়। কিন্তু এতে একটি ঐতিহাসিক জটিলতা এই যে, স্বয়ং কোরআনের একাধিক আয়াত সাক্ষ্য দেয়, ফেরআউন সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর বনী-ইসরাঈল মিসরে প্রত্যাবর্তন করেনি ; বরং তাদের আসল আবাসস্থল পবিত্রভূমি শামের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। সেখানেই তারা এক কাফের জাতির সাথে জেহাদ করে তাদের শহর অধিকার করার আদেশ প্রাপ্ত হয়। বনী-ইসরাঈল এই আদেশ পালনে অস্বীকৃত হয়। ফলে আযাব হিসেবে তীহের উন্মুক্ত ময়দানে একটি প্রাকৃতিক জেলখানা সৃষ্টি করে দেয়া হয়। তারা সে ময়দান থেকে বের হতে পারত না। এমতাবস্থায়ই চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। এই তীহ্ প্রান্তরেই তাদের উভয় পয়গম্বর হযরত মূসা ও হারূন (আঃ) ওফাত পান। এর পরেও ইতিহাসগ্রন্থ থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে, বনী-ইসরাঈল কোন সময় দলবদ্ধ জাতিগত পরিচিতি ও মর্যাদা নিয়ে মিসরে প্রবেশ করেছে। কাজেই ফেরআউন সম্প্রদায়ের বিষয়-সম্পত্তি ও ধন-ভাণ্ডারের উপর বনী-ইসরাঈলের অধিকার কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? তফসীর রূহুল মা'আনীতে এ আয়াতের অধীনেই এ প্রশ্নের দু'টি জওয়াব তফসীরবিদ হযরত হাসান ও কাতাদাহ্ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত হাসান বলেন, আলোচ্য আয়াতে বনী-ইসরাঈলকে ফেরআউনদের পরিত্যক্ত সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করার কথা ব্যক্ত হয়েছে; কিন্তু একথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি যে, এই ঘটনা ফেরআউনের ধ্বংসের তাৎক্ষণিক পর ঘটবে। তীহ্ প্রান্তরের ঘটনার চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পরেও যদি তারা মিসরে প্রবেশ করে থাকে, তবে আয়াতের অর্থে কোনরূপ তফাৎ দেখা দেয় না। ইতিহাস থেকে তাদের দলবদ্ধভাবে মিসরে প্রবেশ করার কথা প্রমাণিত না থাকার আপত্তি মোটেই ধর্তব্য নয়। কারণ, তখনকার ইতিহাস ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের লিখিত মিথ্যা বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ। কাজেই এহেন ইতিহাসের উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। এ কারণে কোরআনের আয়াতে কোনরূপ সদর্থ করার প্রয়োজন নেই। হযরত কাতাদাহ্ বলেন, এই ঘটনাটি কোরআন পাকের একাধিক সূরায় ব্যক্ত হয়েছে, যেমন সূরা আ'রাফের আয়াত ১৩৬, ১৩৭-এ, সূরা কাসাসের আয়াত ৫-এ, সূরা দোখানের আয়াত ২৫ থেকে ২৮-এ এবং সূরা শো'আরার আলোচ্য ৫৯ আয়াতে এ ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। এসব আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, বনী-ইসরাঈলকে বিশেষভাবে ফেরআউন সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত বাগ-বাগিচা ও বিষয়-সম্পত্তির মালিক করা হয়েছিল। এর জন্যে বনী-ইসরাঈলের মিসরে প্রত্যাবর্তন করা জরুরী। কিন্তু এসব আয়াতের ভাষায় এ বিষয়েরও সুস্পষ্ট অবকাশ বিদ্যমান রয়েছে যে, বনী-ইসরাঈলকে ফেরআউন সম্প্রদায়ের অনুরূপ বাগ-বাগিচা ও ধন-ভাণ্ডারের মালিক করা হয়েছিল। এর জন্যে তাদের মিসরে প্রত্যাবর্তন করা জরুরী নয়; বরং অনুরূপ বাগ-বাগিচা শাম দেশেও অর্জিত হতে পারে। সূরা আ'রাফের আয়াত الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا শব্দ থেকে বাহ্যতঃ শামদেশকেই বোঝানো হয়েছে। কেননা, কোরআন পাকের একাধিক আয়াতে بَارَكْنَا ইত্যাদি শব্দ অধিকাংশ স্থলে শামদেশ সম্পর্কেই ব্যবহৃত হয়েছে। তাই হযরত কাতাদাহ্ বলেন যে, বিনা প্রয়োজনে কোরআনের আয়াতের সাথে ইতিহাসের সংঘর্ষ দেখানো দুরস্ত নয়। সারকথা এই যে, যদি ঘটনাবলীর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফেরআউনের ধ্বংসের পর বনী-ইসরাঈল কোন সময়ই সমষ্টিগতভাবে মিসর অধিকার করেনি, তবে হযরত কাতাদাহ্র তফসীর অনুযায়ী উল্লেখিত সব আয়াতে শামদেশে, তার বাগ-বাগিচা ও অর্থ-ভাণ্ডারের মালিক হওয়া বোঝানো যেতে পারে। والله اعلم

قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

– পশ্চাদ্ধাবনকারী ফেরআউনী সৈন্যবাহিনী যখন তাদের সামনে এসে যায়, তখন সমগ্র বনী-ইসরাঈল চীৎকার করে উঠল, হায়, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম! আর ধরা পড়ার মধ্যে সন্দেহ ও দেরীই বা কি ছিল, পশ্চাতে অতিবিক্রম সেনাবাহিনী এবং সম্মুখে সমুদ্র অন্তরায়। এই পরিস্থিতি মূসা (আঃ)-এরও অগোচরে ছিল না। কিন্তু তিনি দৃঢ়তার হিমালয় হয়ে আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তখন ও সজোরে বললেন كَلَّا আমরা কিছুতেই ধরা পড়তে পারি না। কারণ এই বললেন যে, إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন। তিনি আমাদের পথ বলে দেবেন। ঈমানের পরীক্ষা এরূপ স্থলেই হয়ে থাকে। মূসা (আঃ)-এর চোখে-মুখে ভয়ভীতির চিহ্নমাত্র ছিল না। তিনি যেন উদ্ধারের পথ চোখে দেখে যাচ্ছিলেন। হুবহু এমনি ধরনের ঘটনা হিজরতের সময় সওর গিরিগুহায় আত্মগোপনের সময় আমাদের রসূলে মকবুল (সাঃ)-এর সাথেও ঘটেছিল। পশ্চাদ্ধাবনকারী শত্রু এই গিরিগুহার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। সামান্য নীচে দৃষ্টিপাত করলেই তিনি তাদের সামনে পড়ে যেতেন। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) অস্থিরতা প্রকাশ করলে তিনি হুবহু এই উত্তরই দেন لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا চিন্তা করো না, আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন। এই ঘটনার মধ্যে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। যে, মূসা (আঃ) বনী-ইসরাঈলকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে বলেছিলেন إِنَّ مَعِيَ رَبِّي আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জওয়াবে مَعَنَا বলেছেন। অর্থাৎ আমাদের উভয়ের সাথে আল্লাহ্ আছেন। এটা উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য যে, এ উম্মতের ব্যক্তিবর্গ ও তাদের রসূল খোদায়ী সঙ্গ দ্বারা ভূষিত।

وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿٦٦﴾
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ
لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ
وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ﴿٧١﴾
قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾
قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾ قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا
كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ
لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَ
الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾
وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي
خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾
وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَاجْعَلْنِي مِن
وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٨٦﴾
وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا
مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٩٠﴾

(৬৫) এবং মূসা ও তাঁর সংগীদের সবাইকে বাঁচিয়ে দিলাম। (৬৬) অতঃপর অপর দলটিকে নিমজ্জিত করলাম। (৬৭) নিশ্চয় এতে একটি নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না। (৬৮) আপনার পালনকর্তা অবশ্যই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (৬৯) আর তাদেরকে ইবরাহীমের বৃত্তান্ত শুনিয়ে দিন। (৭০) যখন তাঁর পিতাকে এবং তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কিসের এবাদত কর? (৭১) তারা বলল, আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং সারাদিন এদেরকেই নিষ্ঠার সাথে আঁকড়ে থাকি। (৭২) ইবরাহীম (আঃ) বললেন, তোমরা যখন আহবান কর, তখন তারা শোনে কি? (৭৩) অথবা তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে? (৭৪) তারা বলল ঃ না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি, তারা এরূপই করত। (৭৫) ইবরাহীম বললেন, তোমরা কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, যাদের পূজা করে আসছ (৭৬) তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষেরা? (৭৭) বিশ্ব পালনকর্তা ব্যতীত তারা সবাই আমার শত্রু, (৭৮) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করেন, (৭৯) যিনি আমাকে আহার এবং পানীয় দান করেন, (৮০) যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন, (৮১) যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পুনর্জীবন দান করবেন। (৮২) আমি আশা করি তিনিই বিচারের দিনে আমার ক্রটি-বিচ্যুতি মাফ করবেন। (৮৩) হে আমার পালনকর্তা, আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর (৮৪) এবং আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী কর। (৮৫) এবং আমাকে নেয়ামত উদ্যানের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। (৮৬) এবং আমার পিতাকে ক্ষমা কর। সে তো পথভ্রষ্টদের অন্যতম। (৮৭) এবং পুনরুত্থান দিবসে আমাকে লাঞ্ছিত করো না, (৮৮) যে দিবসে ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোন উপকারে আসবে না; (৮৯) কিন্তু যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে আসবে। (৯০) জান্নাত আল্লাহ্‌ভীরুদের নিকটবর্তী করাহবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ এই আয়াতে لِسَانَ বলে আলোচনা বোঝানো হয়েছে এবং এর লাম উপকারার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ এই যে, হে আল্লাহ্‌, আমাকে এমন সুন্দর তরিকা ও উত্তম নিদর্শন দান করুন, যা কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতি অনুসরণ করে এবং আমাকে উৎকৃষ্ট আলোচনা ও সদগুণাবলী দ্বারা স্মরণ করে।—(ইবনে-কাসীর, রূহুল মাআনী) আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। ফলে ইহুদী, খ্রীষ্টান এমন কি মক্কার মুশরেকরা পর্যন্ত ইবরাহীমী মিল্লাতকে ভালবাসে এবং নিজেদেরকে এর অনুসারী বলে। যদিও তাদের ধর্মমত ইবরাহীমী মিল্লাতের বিপরীতে কুফর ও শেরকে পরিপূর্ণ, তথাপি তাদের দাবী এই যে; আমরা ইবরাহীমী মিল্লাতে আছি। মুসলিম সম্প্রদায়ে তো যথার্থরূপেই মিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসারী হওয়াকে নিজের জন্যে গর্বের বিষয় বলে মনে করে।

খ্যাতি ও যশোপ্রীতি নিন্দনীয়, কিন্তু কতিপয় শর্তসাপেক্ষে বৈধ ঃ যশোপ্রীতি অর্থাৎ, মানুষের কাছে নিজের সম্মান ও প্রশংসার আকাঙ্খা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। কোরআন পাক পরকালের নেয়ামত লাভকে যশোপ্রীতি বর্জনের উপর নির্ভরশীল ঘোষণা করেছে। বলা হয়েছে ঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا

আলোচ্য আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) দোয়া করেছেন যে, 'ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে আমার প্রশংসা ও গুণকীর্তন হোক।' এটা বাহ্যতঃ যশোপ্রীতির অন্তর্ভুক্ত মনে হয়। কিন্তু আয়াতের ভাষার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, এই দোয়ার আসল লক্ষ্য যশোপ্রীতি নয় বরং আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে এই দোয়া যে, আমাকে এমন সৎকর্মের তওফীক দান করুন, যা আমার আখেরাতের সম্বল হয়, যা দেখে অন্যদের মনেও সৎকর্মের প্রেরণা জাগে এবং আমার পরেও যেন মানুষ সৎকর্মে আমার অনুসরণ করে। সারকথা এই যে, এই দোয়ার দ্বারা কোন সুখ্যাতি ও যশোলাভ উদ্দেশ্যই নয়। কোরআন ও হাদীসে যে যশোপ্রীতি নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়, তার অর্থ পার্থিব প্রভাব প্রতিপত্তি ও তদ্দ্বারা পার্থিব মুনাফা অর্জন।

ইবনে আরাবী বলেন, আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে সৎকর্মের কারণে মানুষের মধ্যে প্রশংসা হয়, সে সৎকর্ম অন্বেষণ করা জায়েয। ইমাম গাযযালী বলেন, দুনিয়াতে সম্মান ও যশোপ্রীতি তিনটি শর্তসাপেক্ষে বৈধ। (এক) যদি উদ্দেশ্য নিজেকে বড় এবং অন্যদেরকে ছোট ও হেয় প্রতিপন্ন করা না হয়; বরং এরূপ পরকালীন উপকারের লক্ষ্যে হয় যে, মানুষ তার ভক্ত হয়ে সৎকর্মে তার অনুসরণ করবে। (দুই) মিথ্যা গুণকীর্তন লক্ষ্য না হওয়া চাই। অর্থাৎ, যে গুণ নিজের মধ্যে নেই, তার ভিত্তিতে মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা কামনা না করা। (তিন) যদি তা অর্জন করার জন্যে কোন গোনাহ্‌ অথবা ধর্মের ব্যাপারে শৈথিল্য অবলম্বন করতে না হয়।

মুশরেকদের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া বৈধ নয় ঃ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ অন্যত্র কোরআন পাকের এই ফরমান জারি হওয়ার পর এখন যার মৃত্যু কুফরের উপর নিশ্চিত ও

অবধারিত; তার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করা অবৈধ ও হারাম। কেননা, আয়াতের অর্থ এই যে, নবী ও মুমিনদের জন্যে মুশরেকদের মাগফেরাতের দোয়া করা দ্ব্যর্থহীনরূপে নাজায়েয ; যদি তারা নিকটাত্মীয়ও হয়, যদিও তাদের জাহান্নামী হওয়া সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

একটি জিজ্ঞাসা ও জওয়াব ঃ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ —এ আয়াত থেকে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞার পর হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর মুশরেক পিতার জন্যে কেন মাগফেরাতের দোয়া করলেন? আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত নিজেই কোরআন মজীদে এ প্রশ্নের জওয়াব দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ

জওয়াবের সারমর্ম এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) পিতার জন্যে তাঁর জীবদ্দশায় ঈমানের তওফীক দানের নিয়তে আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করেছিলেন। ঈমানের পর মাগফেরাত নিশ্চিত ছিল। অথবা ইবরাহীম (আঃ)-এর ধারণা ছিল যে, তাঁর পিতা গোপনে ঈমান কবুল করেছে, যদিও তা প্রকাশ করেনি। কিন্তু পরে যখন তিনি জানতে পারেন যে, তাঁর পিতা কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করেছে, তখন তিনি নিজের পূর্ণ নির্লিপ্ততা প্রকাশ করে দেন।

পিতার কুফর ও শেরক পিতার জীবদ্দশাতেই হযরত ইবরাহীম (আঃ) জানতে পেরেছিলেন, না তার মৃত্যুর পর, না কেয়ামতের দিন জানবেন, এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ সূরা তওবায় উল্লেখিত হয়েছে।

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন কোন অর্থ-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি কারো কোন উপকারে আসবে না। একমাত্র সে ব্যক্তি মুক্তি পাবে, যে সুস্থ অন্তঃকরণ নিয়ে আল্লাহ্র কাছে পৌছবে। এই আয়াতের استثناء কে استثناء منقطع সাব্যস্ত করে কেউ কেউ তফসীর করেছেন যে, সেদিন কারো অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কাজে আসবে না, একমাত্র কাজে আসবে নিজের সুস্থ অন্তঃকরণ, যাতে শের্ক ও কুফর নেই। এই বাক্যের দৃষ্টান্ত হল, যদি কেউ যায়েদ সম্পর্কে কারো কাছে জিজ্ঞাসা করে যে, যায়েদের কাছে অর্থসম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিও আছে কি? জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি যদি এর উত্তরে বলে যে, সুস্থ অন্তঃকরণই তার অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। এর অর্থ এই যে, অর্থ-সম্পদ সন্তান-সন্ততি তো কিছুই নেই, তবে এগুলোর পরিবর্তে তার কাছে তার নিজের সুস্থ অন্তঃকরণ আছে। এই তফসীর অনুযায়ী আয়াতের সার-বিষয়বস্তু দাঁড়ায় এই যে, সেদিন অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কোন কাজেই আসবে না, কাজে আসবে শুধু নিজের ঈমান ও সৎকর্ম। একেই 'সুস্থ অন্তঃকরণ' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদদের মতে প্রসিদ্ধ তফসীর এই যে, আয়াতের استثناء টি متصل এবং অর্থ এই যে, কেয়ামতের দিন অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন ব্যক্তির কাজে আসবে না সেই ব্যক্তি ছাড়া, যার অন্তঃকরণ সুস্থ অর্থাৎ, সে ঈমানদার। সারকথা এই যে, কেয়ামতেও এসব বস্তু উপকারী হতে পারে; কিন্তু শুধু ঈমানদারের জন্যেই উপকারী হবে – কাফেরের কোন উপকারে আসবে না। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এ স্থলে وَلَا بَنُونَ বলা হয়েছে, যার অর্থ পুত্র সন্তান। সাধারণ সন্তান-সন্ততি উল্লেখ না করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, দুনিয়াতেও বিপদের সময় পুত্র সন্তানের কাছ থেকে উপকারের আশা করা যায়। কন্যা-সন্তানদের কাছ থেকে বিপদের সময় সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা দুনিয়াতেও বিরল। তাই কেয়ামতে বিশেষ করে পুত্র-সন্তানদের উপকারী না হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ দুনিয়াতে এদের কাছ থেকে উপকারের আশা হত।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় এই যে, قلب سليم এর শাব্দিক অর্থ সুস্থ অন্তঃকরণ। হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন, এতে সেই অন্তঃকরণ বোঝানো হয়েছে, যা কলেমায়ে তওহীদের সাক্ষ্য দেয় এবং শেরক থেকে পবিত্র। এই বিষয়বস্তুই মুজাহিদ, হাসান বসরী ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব থেকে ভিন্ন ভাষায় বর্ণিত আছে। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব বলেন, সুস্থ অন্তঃকরণ একমাত্র মুমিনের হতে পারে। কাফেরের অন্তঃকরণ রুগ্ন হয়ে থাকে; যেমন কোরআন বলে فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ ﴿٩١﴾ وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ﴿٩٢﴾
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٩٣﴾ فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا
هُمْ وَالْغَاوٗنَ ﴿٩٤﴾ وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ﴿٩٥﴾ قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا
يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٩٦﴾ تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٩٧﴾ اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٨﴾ وَمَآ اَضَلَّنَآ اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٩٩﴾ فَمَا لَنَا مِنْ شٰفِعِيْنَ ﴿١٠٠﴾
وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٢﴾
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۭ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ
لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٤﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ ۨ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٠٥﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ
اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٠٦﴾ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٠٧﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ
اَطِيْعُوْنِ ﴿١٠٨﴾ وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰي رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١١٠﴾ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ
الْاَرْذَلُوْنَ ﴿١١١﴾ قَالَ وَمَا عِلْمِيْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٢﴾ اِنْ حِسَابُهُمْ
اِلَّا عَلٰي رَبِّيْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ﴿١١٣﴾ وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٤﴾ اِنْ اَنَا
اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١١٥﴾ قَالُوْا لَىِٕنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ
مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ﴿١١٦﴾ قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِيْ كَذَّبُوْنِ ﴿١١٧﴾

(৯১) এবং বিপথগামীদের সামনে উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম। (৯২) তাদেরকে বলা হবে ঃ তারা কোথায়, তোমরা যাদের পূজা করতে (৯৩) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে, অথবা তারা প্রতিশোধ নিতে পারে? (৯৪) অতঃপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টদেরকে অধোমুখি করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে (৯৫) এবং ইবলীস বাহিনীর সকলকে। (৯৬) তারা তথায় কথা কাটাকাটিতে লিপ্ত হয়ে বলবে ঃ (৯৭) আল্লাহ্‌র কসম, আমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলাম, (৯৮) যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্ব-পালনকর্তার সমতুল্য গণ্য করতাম। (৯৯) আমাদেরকে দুষ্টকর্মীরাই গোমরাহ্ করেছিল। (১০০) অতএব আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই (১০১) এবং কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই। (১০২) হায়, যদি কোনরূপে আমরা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেতাম, তবে আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়ে যেতাম! (১০৩) নিশ্চয়, এতে নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১০৪) আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১০৫) নূহের সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যারোপ করেছে। (১০৬) যখন তাদের ভ্রাতা নূহ তাদেরকে বললেন, "তোমাদের কি ভয় নেই? (১০৭) আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত বার্তাবাহক। (১০৮) অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১০৯) আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তাই দেবেন। (১১০) অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।" (১১১) তারা বলল, আমরা কি তোমাকে মেনে নেব যখন তোমার অনুসরণ করছে ইতরজনেরা? (১১২) "নূহ বললেন, তারা কি কাজ করছে, তা জানা আমার কি দরকার? (১১৩) তাদের হিসাব নেয়া আমার পালনকর্তারই কাজ; যদি তোমরা বুঝতে। (১১৪) আমি মুমিনগণকে তাড়িয়ে দেয়ার লোক নই। (১১৫) আমি তো শুধু একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।" (১১৬) তারা বলল, "হে নূহ, যদি তুমি বিরত না হও, তবে তুমি নিশ্চিতই প্রস্তরাঘাতে নিহত হবে।" (১১৭) নূহ বললেন, "হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং পারিবারিক সম্পর্ক পরকালে ঈমানের শর্তে উপকারী হতে পারে ঃ আলোচ্য আয়াতের বহুল প্রচলিত তফসীর অনুযায়ী জানা যায় যে, মানুষের অর্থ-সম্পদ কেয়ামতের দিনেও কাজে আসতে পারে, যদি সে মুসলমান হয়। এটা এভাবে যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বীয় অর্থ-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেছিল কিংবা কোন সদকায়ে জারিয়া করেছিল, যদি সে ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করে মুমিনদের তালিকাভুক্ত হয়, তবে এ ব্যয়কৃত অর্থ ও সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব হাশরের ময়দানে ও হিসাবের দাঁড়িপাল্লায়ও তার কাজে আসবে। পক্ষান্তরে সে যদি মুসলমান না হয় কিংবা আল্লাহ্ না করুন মৃত্যুর পূর্বে বেঈমান হয়ে যায়, তবে দুনিয়াতে সম্পাদিত কোন সৎকর্ম তার কাজে আসবে না। সন্তান-সন্ততির ব্যাপারেও তাই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মুসলমান হলে পরকালেও সে তার সন্তান-সন্ততির উপকার পেতে পারে। এটা এভাবে যে, তার মৃত্যুর পর তার সন্তান-সন্ততি তার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করবে অথবা সওয়াব পৌঁছাবে অথবা সে তার সন্তান-সন্ততিকে সৎকর্মপরায়ণরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। এখন তাদের সৎ কর্মের সওয়াব আপনা-আপনি সেও পেতে থাকবে এবং তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হতে থাকবে। অথবা হাশরের ময়দানে সন্তান-সন্ততি তার জন্যে সুপারিশ করবে। যেমন, কোন কোন হাদীসে সন্তান-সন্ততির সুপারিশ ও তা কবুল হওয়ার বিষয় প্রমাণিত আছে ; বিশেষতঃ অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের সুপারিশ। এমনিভাবে সন্তান-সন্ততি যদি মুসলমান হয় এবং তাদের সৎকর্ম পিতা-মাতার সৎকর্মের স্তরে না পৌঁছে, তবে পরকালে আল্লাহ্ তা'আলা বাপ-দাদার খাতিরে তাদেরকেও বাপ-দাদার উচ্চতম স্তরে পৌঁছিয়ে দেবেন। কোরআন পাকে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে — اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ অর্থাৎ, আমি আমার সৎবন্দাদের সাথে তাদের সন্তান-সন্ততিকেও মিলিত করে দেব। আলোচ্য আয়াতের উল্লেখিত প্রসিদ্ধ তফসীর থেকে জানা গেল যে, কোরআন ও হাদীসে যেখানেই কেয়ামতে পারিবারিক সম্পর্ক কাজে না আসার কথা বলা হয়েছে, সেখানেই উদ্দেশ্য এই যে, যারা মুমিন নয়, তাদের কাজে আসবে না। এমন কি, পয়গম্বরের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীও যদি মুমিন না হয়, তবে তাঁর পয়গম্বরী দ্বারা কেয়ামতের দিন তাদের কোন উপকার হবে না যেমন, হযরত লূত (আঃ)-এর পুত্র, নূহ (আঃ)-এর স্ত্রী এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতার ব্যাপার তাই। কোরআন পাকের নিম্নলিখিত আয়াতসমূহের মর্মও তাই হতে পারে —

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ — فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ

এবং لَا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ

সৎকাজে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার বিধান ঃ وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, শিক্ষাদান ও প্রচারকার্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা দুরস্ত নয়। তাই পূর্ববর্তী মনীষীগণ একে হারাম বলেছেন। কিন্তু পরবর্তীগণ অপারক অবস্থায় একে জায়েয সাব্যস্ত করেছেন। এর পূর্ণ বিবরণ, وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا আয়াতের অধীনে এসে গেছে।

فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِي وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٨﴾
فَأَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ
الْبٰقِيْنَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٢١﴾ وَ
إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٢٢﴾ كَذَّبَتْ عَادُ نِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ
قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ هُوْدٌ أَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٤﴾ إِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ ﴿١٢٥﴾
فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ ﴿١٢٦﴾ وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ أَجْرِيَ
إِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٧﴾ أَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ﴿١٢٨﴾ وَ
تَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ﴿١٢٩﴾ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ
جَبَّارِيْنَ ﴿١٣٠﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ ﴿١٣١﴾ وَاتَّقُوا الَّذِيْ أَمَدَّكُمْ بِمَا
تَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٢﴾ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ ﴿١٣٣﴾ وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿١٣٤﴾ إِنِّيْ
أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٣٥﴾ قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ
أَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ ﴿١٣٦﴾ إِنْ هٰذَآ إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿١٣٧﴾ وَمَا
نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿١٣٨﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَأَهْلَكْنٰهُمْ ۗ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۖ وَ
مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٩﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٤٠﴾
كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ صٰلِحٌ أَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٤٢﴾

(১১৮) অতএব, আমার ও তাদের মধ্যে কোন ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সংগী মুমিনগণকে রক্ষা করুন।" (১১৯) অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর সঙ্গিগণকে বোঝাই করা নৌকায় রক্ষা করলাম। (১২০) এরপর অবশিষ্ট সবাইকে নিমজ্জিত করলাম। (১২১) নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১২২) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১২৩) আদ সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১২৪) তখন তাদের ভাই হুদ তাদেরকে বললেন ঃ 'তোমাদের কি ভয় নেই? (১২৫) আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রসূল। (১২৬) অতএব, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১২৭) আমি তোমাদের কাছে এর জন্যে প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো পালনকর্তা দেবেন। (১২৮) তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে অযথা নিদর্শন নির্মাণ করছ? (১২৯) এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরকাল থাকবে? (১৩০) যখন তোমরা আঘাত হান, তখন জালেম ও নিষ্ঠুরের মত আঘাত হান। (১৩১) অতএব, আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৩২) ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে সেসব বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা জান। (১৩৩) তোমাদেরকে দিয়েছেন চতুষ্পদ জন্তু ও পুত্র-সন্তান, (১৩৪) এবং উদ্যান ও ঝরণা। (১৩৫) আমি তোমাদের জন্যে মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি।" (১৩৬) তারা বলল, তুমি উপদেশ দাও অথবা উপদেশ নাই দাও, উভয়ই আমাদের জন্যে সমান। (১৩৭) এসব কথাবার্তা পূর্ববর্তী লোকদের অভ্যাস বৈ নয়। (১৩৮) আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হব না। (১৩৯) অতএব, তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে লাগল এবং আমি তাদেরকে নিপাত করে দিলাম। এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১৪০) এবং আপনার পালনকর্তা, তিনি তো প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১৪১) সামূদ সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১৪২) যখন তাদের ভাই সালেহ্ তাদেরকে বললেন, "তোমরা কি ভয় কর না?

জ্ঞাতব্য ঃ এ স্থলে فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ আয়াতটি তাকীদের জন্যে এবং একথা ব্যক্ত করার জন্যে আনা হয়েছে যে, রসূলের আনুগত্য ও আল্লাহ্কে ভয় করার জন্যে কেবল রসূলের বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণতা অথবা কেবল প্রচারকার্যে প্রতিদান না চাওয়াই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু যে রসূলের মধ্যে সবগুলো গুণই বিদ্যমান আছে, তার আনুগত্য করা ও আল্লাহ্কে ভয় করা তো আরও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

ভদ্রতা ও নীচতার ভিত্তি কর্ম ও চরিত্র-পরিবার ও জাঁকজমক নয় ঃ قَالُوْٓا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُوْنَ قَالَ وَمَا عِلْمِيْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ — এ আয়াতে প্রথমতঃ মুশরেকদের এই উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, তোমার অনুসারী সকলেই নীচ লোক। আমরা সম্ভ্রান্ত ভদ্রজন হয়ে তাদের সাথে কিরূপে একাত্ম হতে পারি? নূহ (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে অস্বীকৃত হওয়ার এটাই ছিল কারণ। নূহ (আঃ) জওয়াবে বললেন, আমি তাদের কাজকর্মের অবস্থা জানি না। এতে তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, তোমরা পারিবারিক ভদ্রতা অথবা ধন-সম্পদ, সম্মান ও জাঁকজমককে ভদ্রতার ভিত্তি মনে কর, এটা ভুল; বরং সম্মান ও অপমান অথবা ভদ্রতা ও নীচতা প্রকৃতপক্ষে কর্ম ও চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। তোমাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে ইতরজন বলে দেয়াটা তোমাদের মূর্খতা বৈ কিছু নয়। আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম ও চরিত্রের স্বরূপ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নই। তাই প্রকৃতপক্ষে কে ইতরজন এবং কে ভদ্রজন, আমরা তার ফয়সালা করতে পারি না। — (কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কতিপয় দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যা ঃ أَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ইবনে জরীর হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেন যে, رِيْع দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথকে বলা হয়। হযরত মুজাহিদ থেকে ও অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, رِيْع উচ্চস্থানকে বলা হয় এবং এ থেকেই ربع النبات উদ্ভূত হয়েছে। অর্থাৎ, বৃদ্ধিশীল উদ্ভিদ। اٰيَةً এর আসল অর্থ নিদর্শন। এস্থলে সুউচ্চ স্মৃতিসৌধ বোঝানো হয়েছে। تَعْبَثُوْنَ শব্দটি عبث থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অযথা, যাতে কোন প্রকার উপকার নেই। এখানে অর্থ এই যে, তারা অযথা সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করত, যার কোন প্রয়োজন ছিল না। এতে শুধু গর্ব করাই উদ্দেশ্য থাকত। مَصَانِعَ শব্দটি مصنع - এর বহুবচন। হযরত কাতাদা বলেন, مَصَانِعَ বলে পানির চৌবাচ্চা বোঝানো হয়েছে; কিন্তু হযরত মুজাহিদ বলেন যে, এখানে সুদৃঢ় প্রাসাদ বোঝানো হয়েছে। لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ইমাম বোখারী সহীহ্ বোখারীতে বর্ণনা করেন যে, এখানে لعل শব্দটি تشبيه অর্থাৎ, রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত ইবনে-আব্বাস এর অনুবাদে বলেন كانكم تخلدون —অর্থাৎ, যেন তোমরা চিরকাল থাকবে। - (রূহুল মাআনী)

বিনা প্রয়োজনে অট্টালিকা নির্মাণ করা নিন্দনীয় ঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিনা প্রয়োজনে গৃহ নির্মাণ ও অট্টালিকা নির্মাণ করা শরীয়ত মতে দূষণীয়। হযরত আনাসের জবানী ইমাম তিরমিযী বর্ণিত এই হাদীসের অর্থও তাই— অর্থাৎ, প্রয়োজনাতিরিক্ত দালান-কোঠার

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٤٤﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٥﴾ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا
آمِنِينَ ﴿١٤٦﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾
وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ﴿١٤٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٥٠﴾
وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ
لَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ
مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٤﴾ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ
لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ
عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٦﴾ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ﴿١٥٧﴾ فَأَخَذَهُمُ
الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٦٣﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ
إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَ
تَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

(১৪৩) আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। (১৪৪) অতএব, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৪৫) আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তাই দেবেন। (১৪৬) তোমাদেরকে কি এ জগতের ভোগ-বিলাসের মধ্যে নিরাপদে রেখে দেয়া হবে? (১৪৭) উদ্যানসমূহের মধ্যে এবং ঝরণাসমূহের মধ্যে? (১৪৮) শস্যক্ষেত্রের মধ্যে এবং মঞ্জুরিত খেজুর বাগানের মধ্যে? (১৪৯) তোমরা পাহাড় কেটে জাঁকজমকের গৃহ নির্মাণ করছ। (১৫০) সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৫১) এবং সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য কর না; (১৫২) যারা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে এবং শান্তি স্থাপন করে না।' (১৫৩) "তারা বলল, তুমি তো জাদুগ্রস্তদের একজন। (১৫৪) তুমি তো আমাদের মতই একজন মানুষ বৈ নও। সুতরাং যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে কোন নিদর্শন উপস্থিত কর।' (১৫৫) সালেহ্ বললেন, 'এই উষ্ট্রী, এর জন্যে আছে পানি পানের পালা এবং তোমাদের জন্যে আছে পানি পানের পালা— নির্দিষ্ট এক-এক দিনের। (১৫৬) তোমরা একে কোন কষ্ট দিও না। তাহলে তোমাদেরকে মহাদিবসের আযাব পাকড়াও করবে। (১৫৭) তারা তাকে বধ করল। ফলে, তারা অনুতপ্ত হয়ে গেল। (১৫৮) এরপর আযাব তাদেরকে পাকড়াও করল। নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১৫৯) আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১৬০) লূতের সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১৬১) যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বললেন, "তোমরা কি ভয় কর না? (১৬২) আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। (১৬৩) অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৬৪) আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তা দেবেন। (১৬৫) সারা জাহানের মানুষের মধ্যে তোমরাই কি পুরুষদের সাথে কুকর্ম কর? (১৬৬) এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্যে যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন কর? বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।'

মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। হযরত আনাসের অপর একটি রেওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায় — অর্থাৎ, প্রত্যেক দালান-কোঠা তার মালিকের জন্যে বিপদ, কিন্তু যে দালান-কোঠা জরুরী তা বিপদ নয়। রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে; বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য ব্যতীত সুউচ্চ দালান নির্মাণ করা মুহাম্মদী শরীয়তেও নিন্দনীয় ও দূষণীয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ হযরত ইবনে আব্বাস থেকে فَارِهِينَ এর তফসীরে বলা হয়েছে অহংকারী। আবু সালেহ ও ইমাম রাগেবের মতে فَارِهِينَ এর তফসীর حاذقين অর্থাৎ, নিপুণ। অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে এমন কারিগরি শিক্ষা দিয়েছেন যে, তোমরা সহজেই পাহাড়কে গৃহে রূপান্তরিত করতে পার। সারকথা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না।

উপকারী পেশা আল্লাহ্‌র নেয়ামত, যদি তাকে মন্দ কাজে ব্যবহার করা না হয় ঃ এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, উৎকৃষ্ট পেশা আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত এবং তদ্দ্বারা উপকার লাভ করা জায়েয। কিন্তু তা দ্বারা যদি গোনাহ্, হারাম কার্য অথবা বিনা প্রয়োজনে তাতে মগ্ন থাকা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তবে সেই পেশা অবলম্বন না-জায়েয; যেমন পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে বিনা প্রয়োজনে দালানের উচ্চতার নিন্দা করা হয়েছে।

অস্বাভাবিক কর্ম স্ত্রীর সাথেও হারাম ঃ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ আয়াতের من অব্যয়টি বর্ণনাবোধক হতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের যৌন অভিলাষ পূরণের জন্যে আল্লাহ্ তাআলা স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা তাদেরকে ছেড়ে সমজাত পুরুষদেরকে যৌন অভিলাষ পূরণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করছ। এটা হীনমন্যতার পরিচায়ক। من অব্যয়টি এখানে تبعيض এর জন্যেও হতে পারে। এমতাবস্থায় ইঙ্গিত হবে যে, তোমাদের স্ত্রীদের যে স্থান তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যা স্বাভাবিক, সেই স্থান ছেড়ে স্ত্রীদের সাথে এমন অস্বাভাবিক কাজ তোমরা কর, যা নিশ্চিতই হারাম। এই দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে এ বিষয়ও প্রমাণিত হয় যে, নিজ স্ত্রীর সাথে অস্বাভাবিক কর্ম করা হারাম। হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরূপ ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। نعوذ بالله منه (রূহুল মাআনী)

قَالُوا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ﴿١٦٧﴾ قَالَ اِنِّيْ
لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ ﴿١٦٨﴾ رَبِّ نَجِّنِيْ وَاَهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٩﴾ فَنَجَّيْنٰهُ وَ
اَهْلَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٧٠﴾ اِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغٰبِرِيْنَ ﴿١٧١﴾ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿١٧٢﴾
وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿١٧٣﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ
وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٤﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٧٥﴾
كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧٦﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا
تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٧٩﴾
وَمَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٠﴾
اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ
الْمُسْتَقِيْمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ
مُفْسِدِيْنَ ﴿١٨٣﴾ وَاتَّقُوا الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٨٤﴾
قَالُوْۤا اِنَّمَاۤ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿١٨٥﴾ وَمَاۤ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَ
اِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿١٨٦﴾ فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ
اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٨٧﴾ قَالَ رَبِّيْۤ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨٨﴾ فَكَذَّبُوْهُ
فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٨٩﴾

(১৬৭) তারা বলল, "হে লূত, তুমি যদি বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাকে বহিষ্কৃত করা হবে।" (১৬৮) লূত বললেন, "আমি তোমাদের এই কাজকে ঘৃণা করি। (১৬৯) হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এবং আমার পরিবারবর্গকে তারা যা করে, তা থেকে রক্ষা কর।" (১৭০) অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে রক্ষা করলাম। (১৭১) এক বৃদ্ধা ব্যতীত, সে ছিল ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। (১৭২) এরপর অন্যদেরকে নিপাত করলাম। (১৭৩) তাদের উপর এক বিশেষ বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। ভীতি-প্রদর্শিতদের জন্য এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট। (১৭৪) নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১৭৫) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১৭৬) বনের অধিবাসীরা পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১৭৭) যখন শো'আয়ব তাদেরকে বললেন, "তোমরা কি ভয় কর না? (১৭৮) আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। (১৭৯) অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৮০) আমি তোমাদের কাছে এর জন্যে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তাই দেবেন। (১৮১) মাপ পূর্ণ কর এবং যারা পরিমাপে কম দেয়, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (১৮২) সোজা দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন কর। (১৮৩) মানুষকে তাদের বস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে ফিরো না। (১৮৪) ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোক-সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছেন। (১৮৫) তারা বলল, তুমি তো জাদুগ্রস্তদের অন্যতম। (১৮৬) তুমি আমাদের মত মানুষ বৈ তো নও। আমাদের ধারণা-তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। (১৮৭) অতএব, যদি সত্যবাদী হও, তবে আকাশের কোন টুকরো আমাদের উপর ফেলে দাও। (১৮৮) শো'আয়ব বললেন, তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আমার পালনকর্তা ভালরূপে অবহিত। (১৮৯) অতঃপর তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে দিল। ফলে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আযাব পাকড়াও করল। নিশ্চয় সেটা ছিল এক মহাদিবসের আযাব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغٰبِرِيْنَ এখানে عَجُوْزٌ বলে লূত (আঃ)-এর স্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে। সে কওমে লূতের এই কুকর্মে সম্মত ছিল এবং কাফের ছিল।

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সমকামীকে প্রাচীর চাপা দিয়ে অথবা উচ্চ স্থান থেকে নীচে নিক্ষেপ করে শাস্তি দেয়া জায়েয। হানাফী আলেমদের মাযহাব তাই। কেননা, লূত সম্প্রদায়কে এমনিভাবে নিপাত করা হয়েছিল। তাদের জনপদকে উপরে তুলে উল্টা করে মাটিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। — (শামীঃ কিতাবুল হুদূদ)

وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ কারো কারো মতে قسط গ্রীক শব্দ, যার অর্থ ন্যায় ও সুবিচার। কেউ কেউ একে আরবী শব্দ قسط থেকে উদ্ভূত বলেছেন।

এর অর্থও সুবিচার। উদ্দেশ্য এই যে, দাঁড়িপাল্লা এবং এমনি ধরনের মাপ ও ওজনের অন্যান্য যন্ত্রপাতিকে সোজা ও সরলভাবে ব্যবহার কর, যাতে কম হওয়ার আশংকা না থাকে।

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ অর্থাৎ, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না। উদ্দেশ্য এই যে, চুক্তি অনুযায়ী যার যতটুকু প্রাপ্য, তাকে তার চাইতে কম দেয়া হারাম; তা কোন মাপ ও ওজনের বস্তু হোক অথবা অন্য কিছু। এ থেকে জানা গেল যে, কোন শ্রমিক-কর্মচারী নির্ধারিত সময় চুরি করলে এবং কম সময় ব্যয় করলে তাও এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে। ইমাম মালেক মুয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণনা করেন, হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে আসরের নামাযে শরীক না হতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সে কিছু অজুহাত পেশ করল। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, طففت অর্থাৎ, তুমি ওজনে কম করেছ। যেহেতু নামায ওজনের বস্তু নয়, তাই এই হাদীস উদ্ধৃত করার পর ইমাম মালেক বলেন, وفاء وتطفيف অর্থাৎ, প্রাপ্য অনুযায়ী করা অথবা কম করা প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যেই হতে পারে। শুধু মাপ ও ওজনের সাথেই এই বিধান সংশ্লিষ্ট নয়; বরং কারো হক কম দেয়া, তা যেভাবেই হোক না কেন — হারাম। وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ আয়াতে একথা বর্ণিত হয়েছে।

فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ এই আয়াতের ঘটনা এই যে, আল্লাহ্ তাআলা এই সম্প্রদায়ের উপর তীব্র গরম চাপিয়ে দেন। ফলে তারা গৃহের ভেতরে ও বাইরে কোথাও শান্তি পেত না। এরপর তিনি তাদের নিকটবর্তী এক মাঠের উপর গাঢ় কাল মেঘ প্রেরণ করেন। এই মেঘের নীচে সুশীতল বায়ু ছিল। গরমে অস্থির সম্প্রদায় দৌড়ে দৌড়ে এই মেঘের নীচে জমায়েত হয়ে গেল, তখন মেঘমালা তাদের উপর পানির পরিবর্তে অগ্নি বর্ষণ শুরু করল। ফলে সবাই ছাই-ভস্ম হয়ে গেল। — (রূহুল মা'আনী)

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ
لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ
الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ
عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن
يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٩٧﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾
فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾ كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ
الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾ فَيَأْتِيَهُم
بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾
أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ
جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿٢٠٧﴾
وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾ ذِكْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا
ظَالِمِينَ ﴿٢٠٩﴾ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴿٢١٠﴾ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا
يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿٢١٢﴾ فَلَا تَدْعُ مَعَ
اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٣﴾ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ
الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾

(১৯০) নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। (১৯১) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১৯২) এই কোরআন তো বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ। (১৯৩) বিশ্বস্ত ফেরেশতা একে নিয়ে অবতরণ করেছে (১৯৪) আপনার অন্তরে, যাতে আপনি ভীতি-প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন, (১৯৫) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। (১৯৬) নিশ্চয় এর উল্লেখ আছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে। (১৯৭) তাদের জন্যে এটা কি নিদর্শন নয় যে, বনী-ইসরাঈলের আলেমগণ এটা অবগত আছে? (১৯৮) যদি আমি একে কোন ভিন্নভাষীর প্রতি অবতীর্ণ করতাম, (১৯৯) অতঃপর তিনি তা তাদের কাছে পাঠ করতেন, তবে তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করত না। (২০০) এমনিভাবে আমি গোনাহ্গারদের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি। (২০১) তারা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না, যে পর্যন্ত প্রত্যক্ষ না করে মর্মন্তুদ আযাব; (২০২) অতঃপর তা আকস্মিকভাবে তাদের কাছে এসে পড়বে, তারা তা বুঝতেও পারবে না। (২০৩) তখন তারা বলবে, আমরা কি অবকাশ পাব না? (২০৪) তারা কি আমার শাস্তি দ্রুত কামনা করে? (২০৫) আপনি ভেবে দেখুন তো, যদি আমি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগ-বিলাস করতে দেই, (২০৬) অতঃপর যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হত, তা তাদের কাছে এসে পড়ে, (২০৭) তখন তাদের ভোগ-বিলাস তা তাদেব কি উপকাবে আসবে? (২০৮) আমি কোন জনপদ ধ্বংস করিনি; কিন্তু এমতাবস্থায় যে, তার সতর্ককারী ছিল। (২০৯) স্মরণ করানোর জন্যে, এবং আমার কাজ অন্যায়াচরণ নয়। (২১০) এই কোরআন শয়তানরা অবতীর্ণ করেনি। (২১১) তারা এ কাজের উপযুক্ত নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখে না। (২১২) তাদেরকে তো শ্রবণের জায়গা থেকে দূরে রাখা রয়েছে। (২১৩) অতএব, আপনি আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যকে আহ্বান করবেন না। করলে শাস্তিতে পতিত হবেন। (২১৪) আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন। (২১৫) এবং আপনার অনুসারী মুমিনদের প্রতি সদয় হোন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শব্দ ও অর্থসম্ভারের সমষ্টির নাম কোরআন ঃ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ আয়াত থেকে জানা গেল যে, আরবী ভাষায় লিখিত কোরআনই কোরআন। অন্য যে কোন ভাষায় কোরআনের কোন বিষয়বস্তুর অনুবাদকে কোরআন বলা হবে না।

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ থেকে বাহ্যতঃ এর বিপরীতে একথা জানা যায় যে, কোরআনের অর্থসম্ভার অন্য কোন ভাষায় থাকলে তাও কোরআন। কেননা, إِنَّهُ এর সর্বনামটি বাহ্যতঃ কোরআনকে বোঝায়। زُبُرِ শব্দটি زبور এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। আয়াতের অর্থ এই যে, কোরআন পাক পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও আছে। বলাবাহুল্য, তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর ইত্যাদি পূর্ববর্তী কিতাব আরবী ভাষায় ছিল না। কেবল কোরআনের অর্থসম্ভার সেসব কিতাবে উল্লেখিত আছে বলেই আয়াতে বলা হয়েছে যে, কোরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও আছে। অধিকাংশ উম্মতের বিশ্বাস এই যে, কোন সময় শুধু কোরআনের বিষয়বস্তুকেও ব্যাপক অর্থে কোরআন বলে দেয়া হয়। কারণ, কোন কিতাবের বিষয়বস্তুই আসল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে কোরআন উল্লেখিত হওয়ার অর্থও এই যে, কোরআনের কোন কোন বিষয়বস্তু সেগুলোতেও বিবৃত হয়েছে। অনেক হাদীস দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়।

মুস্তাদরাক হাকেমে বর্ণিত হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসারের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, আমাকে সূরা বাক্বারা 'প্রথম আলোচনা' থেকে দেয়া হয়েছে, সূরা তোয়াহা ও যেসব সূরা طٰسٓ দ্বারা শুরু হয় এবং যেসব সূরা حٰمٓ দ্বারা শুরু হয়, সেগুলো মূসা (আঃ)-এর ফলক থেকে দেয়া হয়েছে। এছাড়া সূরা ফাতেহা আরশের নীচ থেকে প্রদত্ত হয়েছে। তাবারানী, হাকেম, বায়হাকী প্রমুখ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন যে, সূরা মুল্ক তওরাতে বিদ্যমান আছে এবং সূরা সাব্বিহিস্মা সম্পর্কে তো স্বয়ং কোরআন বলে যে, إِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرٰهِيمَ وَمُوسَىٰ অর্থাৎ, এই সূরার বিষয়বস্তু হযরত ইবরাহীম ও মূসা (আঃ)- এর সহীফাসমূহেও আছে। সব আয়াত ও রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, কোরআনের অনেক বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও বিদ্যমান ছিল। এতে এটা জরুরী নয় যে, এসব বিষয়বস্তুর কারণে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের যে অংশে এসব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, তাকে কোরআন বলতে হবে। মুসলিম সম্প্রদায়ের কেউ এর প্রবক্তা নয়; বরং অধিকাংশের বিশ্বাস এই যে, কোরআন যেমন শুধু শব্দের নাম নয়, তেমনি শুধু অর্থসম্ভারের নামও নয়। যদি কেউ কোরআনেরই বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন জায়গা থেকে চয়ন করে নিম্নরূপ বাক্য গঠন করে, الحمد لله العزيز الرحيم الذى له ملك السماوات وهو رب العالمين خالق كل شئ وهو المستعان তবে একে কেউ কোরআন বলতে পারবে না।

এমনিভাবে শুধু কোরআনের অর্থসম্ভার অন্য কোন ভাষায় বিধৃত হলে তাকেও কোরআন বলা যায় না।

নামাযে কোরআনের অনুবাদ পাঠ করা সর্বসম্মতক্রমে অবৈধ ঃ এ কারণেই মুসলিম সম্প্রদায় এ বিষয়ে একমত যে, নামাযে ফরয তেলাওয়াতের স্থলে কোরআনের শব্দাবলীর অনুবাদ ফারসী, উর্দু, ইংরেজী ইত্যাদি কোন ভাষায় পাঠ করা অপারক অবস্থা ছাড়া যথেষ্ট নয়। কোন

কোন ইমাম থেকে এ সম্পর্কে ভিন্ন উক্তিও বর্ণিত রয়েছে, কিন্তু সাথে সাথে সেই উক্তির প্রত্যাহারও প্রমাণিত রয়েছে।

কোরআনের বাংলা অনুবাদকে বাংলা কোরআন' বলা জায়েয নয়ঃ এমনিভাবে আরবীর মূল বাক্যাবলী ছাড়া শুধু কোরআনের অনুবাদ কোন ভাষায় লেখা হলে তাকে সেই ভাষার কোরআন বলা জায়েয নয়; যেমন আজকাল অনেকেই শুধু বাংলা অনুবাদকে 'বাংলা কোরআন' ইংরেজী অনুবাদকে 'ইংরেজী কোরআন' বলে থাকে। এটা না-জায়েয ও ধৃষ্টতা। মূল বাক্যাবলী ছাড়া কোরআনকে অন্য কোন ভাষার 'কোরআন' নামে প্রকাশ করা এবং তা ক্রয়-বিক্রয় করা না-জায়েয।

أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَٰهُمْ سِنِينَ এ আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়াতে দীর্ঘ জীবন লাভ করাও আল্লাহ্ তাআলার একটি নেয়ামত। কিন্তু যারা এই নেয়ামতের নাশোকরী করে, বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদের দীর্ঘ জীবনের নিরাপত্তা ও অবকাশ কোন কাজে আসবে না। ইমাম যুহরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয প্রতিদিন সকালে তাঁর শ্মশ্রু ধরে নিজেকে সম্বোধন করে এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَٰهُمْ এরপর অঝোরে কাঁদতে থাকতেন।

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ – عشيرة শব্দের অর্থ পরিবারবর্গ। اقربين বিশেষণ যুক্ত করে তাদের মধ্যেও নিকটতমদেরকে বোঝানো হয়েছে। এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, সমগ্র উম্মতের কাছে রেসালত প্রচার করা ও তাদেরকে সতর্ক করা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ফরয ছিল। আয়াতে বিশেষভাবে পরিবারের লোকদেরকে সতর্ক করার আদেশ দানের রহস্য কি? চিন্তা করলে দেখা যায়, এতে তবলীগ ও দাওয়াতকে সহজ ও কার্যকর করার এমন একটি বিশেষ পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, যার কার্যকারিতা সুদূরপ্রসারী। পদ্ধতিটি এই যে, পরিবারের সদস্যবর্গ অন্যদের তুলনায় নিকটবর্তী। কাজেই প্রত্যেক ভাল ও কল্যাণকর কাজে তারা অন্যদের চাইতে অগ্রণী থাকার অধিকার রাখে। পারস্পরিক সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত পরিচয়ের কারণে তাদের মধ্যে কোন মিথ্যা দাবীদার সুবিধা করতে পারে না। যার সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব পরিবারের লোকদের মধ্যে সুবিদিত, তার সত্য দাওয়াত কবুল করা তাদের জন্যে সহজও। নিকটতম আত্মীয়রা যখন কোন আন্দোলনের সমর্থক হয়ে যায়, তখন তাদের সহমর্মিতা এবং সাহায্যও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। লোকেরা দলগত দিক দিয়েও তার সমর্থন করতে বাধ্য হয়। যখন সত্য ও সততার ভিত্তিতে নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদের একটি পরিবেশ তৈরী হয়ে যায়, তখন প্রাত্যহিক জীবনে প্রত্যেকের পক্ষে ধর্মের নির্দেশাবলী পালন করা সহজ হয়ে যায় এবং তাদেরকে নিয়ে একটি ক্ষুদ্র শক্তি তৈরী হয়ে অপরাপর লোকদের কাছে দাওয়াত পৌছানোর কাজে সাহায্য পাওয়া যায়। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, قُوٓا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا অর্থাৎ, নিজেকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর। এতে পরিবারবর্গকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের স্কন্ধে অর্পণ করা হয়েছে। এটা কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের সহজ-সরল উপায়। চিন্তা করলে দেখা যায়, যে পর্যন্ত পরিবেশ অনুকূল না হয়, সেই পর্যন্ত কোন মানুষের পক্ষে নিজে সৎকর্ম ও সচ্চরিত্রতার অনুসারী হওয়া এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা স্বভাবগতভাবে সম্ভবপর হয় না। সমস্ত গৃহে যদি একজন লোক পূর্ণরূপে নামায পালন করতে চায়, তবে পাকা নামাযীর পক্ষেও যথাযথ হক আদায় করা সুকঠিন হবে। আজকাল হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা দুরূহ হয়ে পড়েছে। এর কারণ এই নয় যে, বাস্তবে তা পরিত্যাগ করা কঠিন কাজ; বরং কারণ এই যে, সমগ্র পরিবেশ ও সমগ্র জ্ঞাতি-গোষ্ঠী যে ক্ষেত্রে গোনাহে লিপ্ত, সেখানে একা এক ব্যক্তির পক্ষে আত্মরক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই আয়াত অবতীর্ণ হবার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পরিবারের সবাইকে একত্রিত করে সত্যের এই পয়গাম শুনিয়ে দেন। তখন তারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকৃত হলেও আস্তে আস্তে পরিবারের লোকদের মধ্যে ইসলাম ও ঈমান প্রবেশ লাভ করতে শুরু করে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পিতৃব্য হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণের ফলে ইসলাম অনেকটা শক্তি সঞ্চার করে।